Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 57
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 47 - 57
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা

ড. প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি
Email ID : pratapbapari@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Subhash Mukhopadhyay, Padatik, Political Poetry, Anti-Fascist Movement, Progressive Writers' Association, Marxism in Bengali Literature, Social Justice, Bengali Modern Poetry.

Abstract
The 1940s in undivided Bengal were marked by political upheaval and revolutionary fervor. Against this backdrop of national unrest and global conflict, poet Subhash Mukhopadhyay emerged as a powerful literary voice. His political poetry of the time deeply absorbed the tension of the era. Although his poems carried strong ideological messages, they never collapsed into empty slogans. Instead, they were artistically restrained, shaped by a deliberate poetic craft. Subhash consciously employed poetry as a tool of political resistance, rejecting romantic escapism and choosing instead to align himself with the working class and their struggles. His poetic journey thus began not in the serenity of personal musings, but in the burning sun, among the oppressed masses.

Subhash Mukhopadhyay was born in 1919 in Naogaon, Rajshahi (present-day Bangladesh). In 1930, his family moved to Kolkata, where he studied at Bhawanipur Mitra Institution and later at Scottish Church College. The sociopolitical events of the 1930s greatly influenced him. In 1935, students in Kolkata organized anti-fascist demonstrations. That same year, the All India Progressive Writers' Manifesto was published, leading to the formal establishment of the All India Progressive Writers' Association in 1936. The Bengal chapter was officially formed on 25 June 1936, with significant intellectual and literary figures involved—including Subhash himself. Rabindranath Tagore was one of its patrons. Other major participants included Naresh Chandra Sengupta, Hirendranath Mukherjee, Buddhadeb Basu, Bishnu Dey, Samar Sen, and Satyendranath Majumdar.

Until the 1930s, Marxist influence in Bengali literature was minimal. However, the 1931 launch of Parichay magazine, edited by Sudhindranath Dutta, became a key platform for Marxist thought. By 1939, the Communist Party had established district units in 28 districts of Bengal, gradually expanding the influence of socialist ideology across the region. Writers and cultural activists, including Subhash, contributed to this ideological shift with

life-affirming progressive literature. Subhash's first poetry collection, Padatik, was published in 1940. It was followed by numerous other notable works, including Agnikon (1948), Chirakut (1950), Phul Phutuk (1957), Ei Bhai (1971), and Dharmer Kol (1991). His poetry evolved in style, tone, and technique, yet remained rooted in a deep commitment to social justice.

Discussion

দেশভাগ-পূর্ববর্তী অখণ্ড বাংলার চল্লিশের দশক ছিল বিপ্লবের দশক। একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। একই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। এই উত্তপ্ত পরিবেশে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কবিতাগুলির সম্পূর্ণ অভিযোজন ঘটেছিল। তাঁর কবিতায় জনজীবনের কথা, রাজনৈতিক বার্তা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলেও তা কখনোই অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হয়নি, শৈল্পিক কাঁটাতারে আটকে পড়েছে সুভাষের লেখনীর গুণে। সচেতন ভাবেই কবিতাকে তিনি বক্তব্য প্রকাশের হাতিয়ার করলেন। তাই কাব্যজীবন শুরু করলেন কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে, এক লহমায় মিশে গেলেন সর্বহারার ভিড়ে। সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা ঘরে বসে ফুল খেলবার কথা তাঁর মনে এলো না। প্রেমের ভাবাকাশে তিনি তাকাতে চাইলেন না, চোখ রাখলেন পৃথিবীর দিকে। এখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যপথের বাঁকবদল ঘটে গেল। প্রেমকে পাশকাটিয়ে তিনি গেলেন প্রতিবাদের পথে। ফুলের শরে তিনি মূর্চ্ছা খেলেন না বরং চিমনির মুখে শুনতে পেলেন সাইরেনের আওয়াজ। সুভাষের চেতনায় পৌঁছে গেলো আগাম ধ্বংসের বার্তা। তাই কাব্যের প্রতিপক্ষে তিনি মনকে শক্ত করে বাঁধতে চাইলেন, হাতে তুলে নিলেন হাতুড়ি আর কাস্তে। কুয়াশা-কঠিন বাসরের মায়া কাটিয়ে 'নব যুগ' আনার জন্য তিনি রাজপথে কমরেডদের আহ্বান জানালেন কবিতার মাধ্যমে। রাজনীতি আর কবিতা একাকার হয়ে গেল জনারণ্যে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নওগাঁ গ্রামে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনে এবং পরবর্তীতে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা করেন। এইসময় ঘটে যাওয়া বেশকিছু ঘটনা তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৫ সালের অগাস্ট মাসে ছাত্ররা কলকাতায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দিবস পালন করে। একই বছরের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক'-এর ইস্তেহার, একবছর পরে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মানস-চেতনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। ১৯৩৬ সালের ২৫ জুন কলকাতায় আনুষ্ঠানিক ভাবে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও জড়িত ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথও এই সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সায়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সমর সেন প্রমুখ। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সৃজনশীল সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনার প্রকাশ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ হলে, তা মার্কসবাদী চেতনা প্রকাশের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই অবিভক্ত বাংলায় আটাশটি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠন গড়ে উঠলে সমাজে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রভাববলয় বিস্তৃত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা জীবনবাদী প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষ ঘটাতে থাকেন। অন্যদিকে অবিভক্ত ভারতবর্ষ তখন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন দ্বারা শৃঙ্খলিত ও পরাধীন। এমন সময়ে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য 'পদাতিক'। এরপর সময় যত গড়িয়েছে, সুভাষের চেতনা আরো ঋদ্ধ হয়েছে, তাঁর কাব্যভাষায় এসেছে বদল, শৈলীতে এসেছে নতুনত্ব। কবিতার প্রকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ তিনি পেয়েছে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট (১৯৫০), 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), 'যতদূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে'

(১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে' (১৯৮১), 'চইচই-চইচই' (১৯৮৩), 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫), 'যা রে কাগজের নৌকা' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল' (১৯৯১)।

'পদাতিক' কাব্য প্রকাশকালে কবির বয়স মাত্র একুশ বছর। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কাঁচা বয়সের রচনা হলেও কবিতাগুলি আবেগসর্বস্ব অপরিণত মনের রচনা হয়ে ওঠেনি, বিষয়বস্তু অনুযায়ী শব্দচয়ন এবং চিত্রকল্প রচনায় তিনি কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিলেন। প্রকরণে আনলেন নতুনত্ব। জয় করলেন পাঠকের মন। হয়ে উঠলেন 'পদাতিক কবি'। এই 'পদাতিক' কাব্য রচনার সময়েই তিনি আকৃষ্ট হলেন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি। একবছরের মধ্যেই যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তরুণ কবির চোখে তখন দিন বদলের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠল কবিতা। রাজনৈতিক নিষ্ঠা এবং সক্রিয়তার কারণে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলেন। ওই বছরেই তিনি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক পদ লাভ করলেন। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন তরুণ কবি। কিন্তু তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন না। আবেগের সংযমে বেঁধে ফেললেন তাঁর কথামালাকে। বাংলা কবিতা পেয়ে গেল এক নতুন কণ্ঠস্বর।

'পদাতিক'-এর কবিতাগুলো লেখা হয়েছে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে কবির এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরেই কাব্যজগতে সাড়া পড়ে যায়। 'পদাতিক' প্রকাশের বছরেই কবি, সমালোচক ও সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু এই গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখলেন—

> "সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য: প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তার রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিলো। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে করি।"[১]

সময় যেমন নির্মাতা, তেমনই আক্রমণকারী—তার ছায়া পড়ে কবির উপর, তার অভিঘাতে কেঁপে ওঠে কবির আত্মা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও শৈশব এক দুরন্ত, অগ্নিগর্ভ যুগে— যেখানে পৃথিবীময় বেজে চলেছে যুদ্ধের দামামা, বিপ্লবের পদধ্বনি, মহামারীর দীর্ঘশ্বাস। সেই আগুনের হলকা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করেছিল। এমন সময়ের প্রেক্ষাপটে, এক বিবেকবান স্রষ্টার পক্ষে নিস্পৃহ হয়ে কাব্যচর্চায় মগ্ন থাকা যেন নৈতিক পরাজয়ের শামিল। সুভাষ, যিনি অন্তরে অন্তরে এক সাম্যবাদী, তাঁর পক্ষে তো তা একেবারেই অচিন্তনীয়। তাই তিনি সজ্ঞানভাবে ছিন্ন করলেন বাংলা কবিতার প্রচলিত দুই প্রিয় উপাদান—প্রেম ও প্রকৃতির মুগ্ধতা। তাঁর কবিতার কেন্দ্রে উঠে এলো মানুষ—শ্রমজীবী, প্রান্তিক, লাঞ্ছিত মানুষের মুখ। তিনি হয়ে উঠলেন জনমানুষের কণ্ঠস্বর। পরাধীন ভারতের বুক থেকে তাঁর উচ্চারণ ছড়িয়ে পড়ল মুক্তির আহ্বানে—যেখানে ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত চেতনায় নিহিত রয়েছে সমাজবদলের পথ। সুভাষ জানতেন, বিপ্লব একার নয়, তা সর্বহারার সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল। মুক্তি লুকিয়ে আছে জনতার ভেতরেই, সংহতির সেই কণ্ঠে। তাই তাঁর কলমে ফুটে উঠল সংগ্রামী গণসঙ্গীত, যেটি নিছক কবিতা নয়— তা এক আন্দোলনের ভাষা, স্বপ্নের ছন্দ, আর আশার অস্ত্র—

> "আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
> একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;
> আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
> শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ চিনে।।"[২]
>
> (সকলের গান)

আকাশের চাঁদের হাতছানি, প্রজাপতির রঙিন ডানার ঝলকানি, ফুলের সৌরভ— কোনোকিছুই তাঁকে আটকে রাখতে পারলো না কাব্যের গতানুগতিক উদ্যানে। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে যুবসমাজকে রাজপথে আসার আহ্বান জানালেন, প্রবল ভাবে মিশে গেলেন জনারণ্যে। একক আত্মগাথা নয়, 'সকলের গান' হয়ে যৌথ স্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো কবিতায়। এ-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 57
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন— ‘‘প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।’’[৩] পরিস্থিতি প্রতিকূল জেনে কবি চোখ থেকে রঙিন স্বপ্নকে মুছে ফেলেছেন, আত্মবিশ্বাসে ভর করে সংকটের মুখোমুখি হতে চাইছেন। জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে বেঁচে থাকার আর্তি ফুটে উঠেছে কবিতায়—

‘‘চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।’’[৪]

(মে-দিনের কবিতা)

বাংলা কবিতায় ‘কাস্তে’র প্রতীকী ব্যবহার নতুন নয়— চল্লিশের দশকে দিনেশ দাশের কবিতায় আমরা প্রথম তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করি। সেই কাস্তেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় নতুন তাৎপর্যে ধারণ করলেন। তাঁর কাছে কবিতা নিছক অনুভবের প্রকাশমাত্র নয়, বরং এক যুদ্ধের অস্ত্র। তাই কবিতার ছত্রে ছত্রে বাজে সাইরেনের শব্দ, ধোঁয়ায় ঢেকে থাকা চিমনির মুখ থেকে উঠে আসে শ্রমিকের নিঃশ্বাস। কেবল কাস্তে নয়— সুভাষের কাব্যে হাতুড়ি ও কাস্তে এসে মিলিত হয় এক অনন্য প্রতীকে, যা শিল্প ও কৃষিকে পাশাপাশি দাঁড় করায়। হাতুড়ি কলকারখানার শ্রমঘর্ম বাস্তবকে চিহ্নিত করে, আর কাস্তে যুক্ত হয় মাঠের মাটি ঘেঁষা কৃষকের প্রাণসংগ্রামের সঙ্গে। এই দুটি প্রতীক, দুটি জীবিকার হাতিয়ার—শিল্প ও কৃষি— সুভাষের কবিতায় হয়ে ওঠে জনগণের জীবনের মূর্ত প্রতিধ্বনি। “কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ” — এই শ্লোগান যেন নিরবে প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর কবিতার ভিতরেই, যেখানে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়বোধ। শিল্প হয়ে ওঠে এখানেই মানবমুক্তির ভাষ্য, আর কবিতা তার নিঃশব্দ বিপ্লব।

‘কানামাছির গান’ কবিতায় ভ্রান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের পাশাপাশি অলীক কল্পনার রাজ্যে ডুবে থাকার জন্য কবি নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছেন। ‘একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে’ শব্দবন্ধে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি হতাশা প্রতিফলিত হয়েছে। কবির চোখের সামনে থেকে মায়ার আবরণ খসে পড়েছে। কবি দেখছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বের ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করছে। শাসকের রক্তচক্ষু বিপ্লবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি মনে করছেন ‘সবাই আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী’; পরাধীনতার সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি আস্থা রেখেছেন শ্রমজীবী মানুষের ওপরে—

‘‘কৃষক, মজুর! তোমার শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি;
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।’’[৫]

(কানামাছির গান)

রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্যের ‘বধূ’ কবিতার নামকরণের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও লিখলেন ‘বধূ’ নামের কবিতা। গ্রাম্য মেয়ে শহরে এসেছে বধূ পরিচয় নিয়ে। পাষাণনগরীতে তার মন যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, হঠাৎ তার মনে পড়েছে গ্রামজীবনের সুখকর দিনগুলির কথা—

‘‘কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা।’’[৬]

(বধূ)

আসলে এই কবিতার বধূ আর সুভাষের কাব্যাত্মা যেন একটি বিন্দুতে মিলে গেছে। দেশের উত্তাল পরিবেশে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ক্লান্ত সুভাষ যেন গ্রামের শীতল পরিবেশে দুদণ্ড শান্তি খুঁজে পাওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 57
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রামের শান্ত নিবিড় পরিবেশ সুখকর হলেও দেশ যে তখনও পরাধীন— এ কথা ভেবেই কবির অন্তরাত্মা আলোড়িত হচ্ছে। তাই 'হানা' শব্দটিকে কবি ব্যবহার করলেন। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বধূ' কবিতার গ্রামের মেয়েকে শহরের পটভূমিতে স্থাপন করে, তার দুঃখকে বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু সুভাষের কবিতায় কেবল মেয়েটির অবস্থান পরিবর্তনজনিত কষ্টকর জীবন নয়, পাশাপাশি উঠে এসেছে বিনিয়োগের কথা, লাভ-লোকসানের কথা। এখানেই সুভাষের স্বকীয়তা। এই কবিতা থেকেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে কবি নিজের শিল্পীসত্তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন, যা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে আরো স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে।

১৯৪০ সালে 'পদাতিক' কাব্যের প্রকাশের পর থেকে ১৯৪৮ সালে 'অগ্নিকোণ' কাব্য প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে যেসব কবিতা ধরা পড়ে, সেগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংকলিত হয় 'চিরকুট' কাব্যে। এই রচনাগুলির বেশিরভাগই রচিত হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে। যদিও শুরুতে এই কবিতাগুলি অপ্রকাশিত ছিল, পরবর্তীতে 'অগ্নিকোণ' কাব্যের কবিতাগুলির সঙ্গে একত্র করে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় পূর্ণাঙ্গ 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থ। যে পথে তিনি 'পদাতিক'-এ যাত্রা শুরু করেছিলেন, 'চিরকুট'-এ এসে মনে হয় সেই পথেই যেন তিনি খুঁজে পেলেন স্বপ্নের ঠিকানা। এই অন্তর্বর্তী সময়ের নানা কর্মকাণ্ডই তাঁর আত্মিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। ১৯৪৩ সালে তিনি শহরের কোলাহল ছেড়ে গ্রামীণ জীবনের দিকে এগিয়ে যান পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্বে। ১৯৪৪ সালে তাঁকে দেখা যায় বোয়ালখালির মাটি চষে বেড়াতে— এক শহুরে কবি, যিনি এবার গ্রামীণ জীবনের বাস্তব রূপ ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মাঝে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাইছেন। তবে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে টানেনি। মেঠো পথের মায়া, শিশিরস্নাত ঘাসের কোমলতা, কিংবা পাখির গানে বিভোর হবার কবি তিনি নন। বরং তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেই মাটির দিকে, যা সিক্ত হয়েছে পরিশ্রান্ত কৃষকের রক্ত আর ঘামে—যেখানে প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে সংগ্রামের এক একটি অধ্যায়, শোষণ-বঞ্চনার অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, এবং পেট ভরে দু-মুঠো ভাত জোগাড় করার নিরন্তর লড়াই। এই সর্বহারার অস্তিত্বসংগ্রামই হয়ে উঠল 'চিরকুট' কাব্যের অন্তর্নিহিত সুর— যেখানে কাব্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল জীবনের কঠোর বাস্তব, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন। এ যেন কবিতায় জনতার আখ্যান, আর কবিতার ভাষায় সংগ্রামের ইতিহাস। যদিও 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' কবি জানাচ্ছেন—

> "সেদিনকার শানিতধার হারিয়েছি
> হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
> বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুশীমত
> লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি।"[৭]
>
> (কাব্য-জিজ্ঞাসা)

কিন্তু পাঠক জানে এ কেবল কবির বিনয়। 'চিরকুট' পর্বে কবির লেখনী ক্রমশ ধারালো হয়েছে। 'চিরকুট' কাব্য রচনাকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পুরোপুরি পার্টির হোলটাইমার। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনসহ সমস্ত আন্দোলনে যোগদান করে তাঁর চেতনা যেমন শানিত হয়েছে, তেমনি পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূত্রে গ্রামে ঘোরার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম সম্পর্কে ধারণার বদল ঘটে গেল। সুভাষ-পূর্ববর্তী কবিদের কবিতায় গ্রাম্য জীবনের যে মনোরম দৃশ্য উঠে এসেছে, তা সুভাষ খুঁজে পেলেন না। কারণ তিনি কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করছেন না, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে হাজির হয়েছেন। তাঁর গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে 'গ্রাম্য' কবিতায়—

> "সম্প্রতি গ্রামে আছি, কোথাও
> প্রাণোৎসবের নেই নিশানা
> উপবাসী চাষা, ধান উধাও
> মহাজনদের পন্থা জানা।"[৮]
>
> (গ্রাম্য)

গ্রামীণ কবিতার পরিসরে এসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন সরাসরি আঘাত হানলেন গ্রামীণ অর্থনীতির ভঙ্গুর ভিতের উপর। কবিতার অন্তরালে উঠে এল শোষক ও শোষিতের নিরাবরণ দ্বন্দ্ব, যা এতদিন গ্রামীণ সমাজে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হত। শোষণচক্রের কেন্দ্রে থাকা লোলুপ মহাজনের দমন-পীড়নের মুখে অসহায় কৃষকের নিঃশব্দ আর্তি সুভাষের বিপ্লবী চেতনাকে কাঁপিয়ে তোলে। ফলত, কবি আর নীরব থাকেন না— তিনি কবিতার ভাষায় সরাসরি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, "তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার/ শত্রু পরখ করুক ধার।" যে কাস্তে আর লাঙল দিয়ে কৃষক বছরের পর বছর জমি চষে ফসল ফলায়, সেই ফসলের সিংহভাগ থেকে সে বঞ্চিত হয় মহাজন, জমিদার বা প্রভুদের চক্রান্তে। কবি তাই কাস্তে-লাঙলের প্রতীক সরিয়ে তার বদলে কৃষকের হাতে তুলে দিতে চান কুঠার— আন্দোলনের, প্রতিরোধের প্রতীক। আপোস ও অসহায়তার দিন যেন শেষ হয়েছে; এখন প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। সর্বহারার সম্মিলিত বিপ্লবই সমাজকে শোষণমুক্ত করতে পারে— এই বিশ্বাসই সুভাষের কবিসত্তাকে প্রেরণা দেয়।

'চিরকুট' কাব্যের নাম কবিতাটিতেই এই দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে রচিত এই কবিতা হয়ে ওঠে এক বেদনাবিধুর দলিল, যেখানে মহাজনি শোষণ, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষকের বঞ্চনার চিত্র নির্মম স্পষ্টতায় তুলে ধরা হয়েছে। সুভাষ এখানে কেবল বাংলার কথা বলেননি; তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক অথচ কৃষকবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতা। বাংলার কৃষি-অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষক হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি। তাঁদের অধিকাংশের কাছেই জমি ছিল না, ছিল না চাষের নির্ভরযোগ্যতা কিংবা সুরক্ষা। ভাগচাষিরা, যাদের জমি নেই কিন্তু উৎপাদনে অংশ নিতে হয়, তারা যুগ যুগ ধরে ঝুঁকিপূর্ণ চাষে ন্যূনতম পাওনায় বাধ্য হয়েছে। তাদের দারিদ্র্যকে পুঁজি করে মহাজন ও জমিদারশ্রেণি গড়ে তুলেছিল নিপীড়নের এক কুশলী কাঠামো। পেটের দায়ে কৃষক যখন ঋণের ফাঁদে পা রাখে, তখনই শুরু হয় তার নিয়ন্ত্রিত পতন। চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ বেড়ে চলে, অথচ শ্রমের বিনিময়ে মিলত না সম্মানজনক জীবিকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বিশেষত খরা বা অনাবৃষ্টির মতো পরিস্থিতি— এই দুর্দশাকে করে তুলত আরও তীব্র। সেচব্যবস্থা হয়তো ছিল কিছু সমৃদ্ধ কৃষকের নাগালে, কিন্তু ভাগচাষির কাছে তা রয়ে যেত স্বপ্নের মতোই দূরে। ফসল ঘরে না উঠলেও ঋণের বোঝা বাড়ে, আর কৃষক ডুবে যেতে থাকে অপুষ্টি, ঋণ আর দুর্ভিক্ষের অতল গহ্বরে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই বাস্তবতাই উঠে আসে নির্মম সাহচর্যে— যেখানে কল্পনার রং নেই, আছে রক্ত, ঘাম আর উপোসী পেটের দীর্ঘশ্বাস—

"হাত পাতবে কার কাছে কে
গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোষ দিয়ে
খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক
পরনে যা আছে তাতে
ঢাকে না কো লজ্জা
ঘটি বাটি বেচেছি সব—
নিজের ব'লতে ছিলো যা।"[৯]

(চিরকুট)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুঃশাসনীয়' গল্পে এইরকম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতাটি শুধুমাত্র অসহায় কৃষকের দীর্ঘশ্বাসে থেমে যায় না; বরং এই হাহাকারের ভেতর দিয়েই কবি খুলে দেন ভবিষ্যতের এক দৃপ্ত স্বপ্নদুয়ার। কারণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিছক বেদনা-বর্ণনার জন্য গ্রামে আসেননি—তিনি এসেছিলেন সামাজিক রূপান্তরের প্রত্যয় নিয়ে। তিনি ছিলেন শ্রেণি-সচেতন, প্রগতিশীল চিন্তার ধারক; তাঁর লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ কাঠামোর গভীরে প্রোথিত অন্যায় শ্রেণি-ব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে তোলা। সুভাষ বিশ্বাস করতেন, অনুগ্রহের ভিক্ষায় নয়— মানুষকে বাঁচতে হবে নিজের অধিকারে, নিজের লড়াইয়ে। তাই তাঁর কবিতায় দরিদ্র, নিরক্ষর কৃষকের চোখেও তিনি রোপণ করেন আত্মনির্ভরতার স্বপ্নবীজ। খাদ্য, বস্ত্রের মতো মৌলিক অধিকার থেকে যারা দীর্ঘদিন বঞ্চিত, তারা আর মুখ পানে চেয়ে থাকবে না প্রশাসনের, রাষ্ট্রের, কিংবা জমিদারের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 57
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করুণার। তারা এবার নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়—জমি তাদের অস্তিত্ব, মাটি তাদের চেতনা। সেই জমির অধিকারে তারা আপস করবে না। আর এই রুখে দাঁড়ানোর সুরেই ধ্বনিত হয় জমিদারের প্রতি স্পষ্ট সতর্কবার্তা। এই সময়টায় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠী— বিশেষত কৃষকদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তুলে জমিদার-মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জোটবদ্ধ আন্দোলনই পারে দাবিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিতে, তাকে বাস্তব রূপ দিতে। সুভাষ ছিলেন সেই চেতনার আন্তরিক ধারক ও বাহক— কেবল পার্টির সদস্যরূপে নয়, একজন আদর্শবাদী কবি হিসেবে। তিনি জানতেন, একটি শ্রেণির দাবি যদি সমগ্র জনমানসকে স্পর্শ করতে পারে, তাহলে তার সাফল্য সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাঁর বিশ্বাস গভীর ছিল, স্থির ছিল; তাই তাঁর কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি হয়ে ওঠে কেবলমাত্র অভাবের অনুযোগ নয়, বরং প্রতিবাদের প্রেরণা, সংঘবদ্ধতার আহ্বান, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তাই তাঁর লেখনী, সহস্র কৃষকের যৌথ কণ্ঠস্বর হয়ে সংগ্রামের বার্তা দিল—

> “হাজার খানের প্রজা আছি
> আমরা এই মৌজায়
> সবাই মিলে ঠিক ক’রেছি
> কেমন ক’রে বাঁচা যায়।”[১০]
>
> (চিরকুট)

বাংলা কবিতায় গণ-প্রতিরোধের এমন দৃঢ়বদ্ধ সংকল্প এর আগে দেখা যায়নি। সুভাষই তা করে দেখালেন। কারণ তিনি জনগণের কবি। শিল্পের দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেও কবিতাকে কীভাবে জনগণের দাবিতে পরিণত করতে হয়, তা তিনি জানেন। কিন্তু এতকিছুর পরেও গ্রাম্য অর্থনীতির বেহাল চিত্র সুভাষের দৃষ্টি এড়ায়নি। চোখের সামনে তিনি দেখছেন বিপর্যস্ত গ্রামীণ জীবনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অসহায় কৃষক তার জীবিকা পরিবর্তন করে কুলি-মজুর হওয়ার আশায় শহরের পথে পা বাড়িয়েছে। তার ছেড়ে যাওয়া সাতপুরুষের নির্জন ভিটের করুণ দৃশ্য তুলে ধরেছেন কবি—

> “গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে
> শূন্য ঘর, শূন্য গোলা
> ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
> শুকনো তুলসীর মঞ্চে
> নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
> আগাছায় ভরেছে উঠোন।”[১১]
>
> (স্বাগত)

সন্ধ্যায় মাঠ থেকে রাখাল আর গরু নিয়ে ফেরা না, শূন্য গোয়াল একলাই পড়ে থাকে। দীঘিতে কেউ জল নিতে আসে না, নির্জন ঘাট স্থির হয়ে আকাশপানে তাকিয়ে থাকে। ঢেকিশাঁলা নিস্তব্ধ। নবান্ন উৎসব অলীক কল্পনার বস্তু হয়ে গেছে। তাঁতির তাত বন্ধ, কলুর ঘানি বন্ধ, কুমোরের ঠাকুর গড়া বন্ধ, পাড়ার দোকানী নিরুদ্দেশ। তবে যে ভগ্ন গ্রাম্যজীবনের ছবি প্রথমে উঠে এসেছে, কবিতার শেষে যেন তার উল্টো প্রতিচ্ছবি। কবিতার অন্তিমে রয়েছে তীব্র জীবনানুরাগের কথা—

> “পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
> আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
> নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
> মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
> ধান আর ধান।”[১২]
>
> (স্বাগত)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বাক্ষর’ কবিতায় ধরা পড়ে সময়ের উত্তাল অভিঘাত— যেখানে মানুষের মুখে অনাহারের ছায়া, হাতে কাঁপতে থাকা ভিক্ষার পাত্র। কবি যেন নির্লিপ্ত নন এই সামাজিক সংকটের ছবি আঁকতে গিয়ে, বরং গভীর

সহানুভূতিতে তুলে ধরেন— উদ্বাস্তু সংসারে কীভাবে ভেঙে পড়েছে সম্পর্কের কোমলতা, হারিয়ে যাচ্ছে মা-মাটির মমতার সুর। এই মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি কবি দৃষ্টিপাত করেন এক ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধির দিকে— এক 'কীট-শ্রেণি'র উত্থান, যারা মহাজনি ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে, দালালিকে পেশা করে গড়ে তোলে শোষণের নতুন বলয়। এই শ্রেণিই গোপনে চালের আড়তে লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য আটকে রেখে সৃষ্টি করে কৃত্রিম অভাব, সমাজে সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট। ফলে দেশ এগিয়ে যেতে থাকে এক ধ্বংসের দিকে, যেন নিঃশব্দ সর্বনাশের পদধ্বনি শোনা যায় বাতাসে। তবু কবি নিঃসঙ্গ নন, নিরাশ নন। সুভাষ বিশ্বাস রাখেন— যতই শোষক গর্জে উঠুক, শোষিতের কণ্ঠই শেষ পর্যন্ত উত্থিত হবে অধিকারের দাবিতে। তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল, প্রতিবাদের সেই সুর একদিন ছাপিয়ে যাবে ভয়ের সকল উচ্চারণ, ইতিহাসের রথচক্র ঘুরে দেবে নতুন পথে। সেজন্য গণ-প্রতিরোধেই আস্থা রাখলেন কবি—

"জানি তবু জয়োদ্ধত মুক্তির নিশান,
আন্দোলিত জনস্রোত প্রবল প্রতাপে
নিজের মুঠিতে আজ নিয়তিকে টানে।
সম্মিলিত হাতে তুলে আনে
উন্মুক্ত আলোয় অন্ধ ঘরের ফসল।
দৃঢ়পণ প্রতিরোধে, নিরন্নের ত্রাণে
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু।
মাঠে মাটে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়,
কণ্টকিত আসে বিপর্যয়,
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি সেইদিনের স্বাক্ষর।"[১৩]

(স্বাক্ষর)

সুভাষের কবিতার বারবার দেশকাল ছাপিয়ে উঠে আসে বিশ্বজনীন সংগ্রামের স্পন্দন। 'জনযুদ্ধের গান', 'চীন', 'স্টালিনগ্রাড' প্রভৃতি কবিতায় তিনি কেবল ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বরং রাশিয়া, চীন ও শ্যামদেশের সাধারণ মানুষের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ও ঐতিহাসিক সংগ্রামের কাব্যিক নথি রচনা করেন। কখনো আগ্রাসী জাপানের বিরুদ্ধে চীনের অবিচল জনগণের জেদ, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসায় তিনি উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন; আবার সেই উদাহরণ টেনে ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— যাতে সংগ্রামের চেতনা কেবল অতীত নয়, বর্তমান ও আগামী দিনেও প্রাসঙ্গিক থাকে। চীনের গ্রাম থেকে শহর, বন্দর থেকে যুদ্ধের ময়দান— সবখানেই কবি যেন নিজ চেতনায় প্রত্যক্ষ করেছেন সেই জাগরণ, যেখানে বিপ্লবীদের হাতে বারবার ভেঙে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদের মসনদ। তাঁর কবিতায় শুধু বিজয়ের ঘোষণা নেই, আছে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা এবং সংগ্রামী উজ্জ্বলতা। ট্যাংক, কামান, রাইফেল— এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে গণমানুষের যে অবিচল প্রতিরোধ, তারই কাব্যিক ছায়াচিত্র তিনি আঁকেন— যেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক অনন্য প্রতীক। এই আন্তর্জাতিক চেতনার পাশাপাশি সুভাষের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তৎকালীন ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের অনুরণন। 'পনেরোই ফের আসবো' কবিতাটি বন্দিমুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। এখানে কবি নিছক প্রতিবাদ করেন না— তিনি লড়াইয়ের শপথে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেন ফের ফিরে আসার অঙ্গীকার, সংগ্রামকে আরও গভীরতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। অন্যদিকে 'ময়দানে চলো' কবিতায় উঠে আসে তার ও ডাক বিভাগের কর্মীদের আন্দোলনের কথা। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে কবি যে কণ্ঠস্বর তুলে ধরেন, তা তাঁর সামগ্রিক কবিসত্তার শ্রেণিচেতনামূলক দিককে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করে। আন্দোলন শুধু প্রেক্ষাপট নয়, হয়ে ওঠে কবিতার আত্মা।

'চিরকুট' পর্বে কবির লেখনী ক্রমশ ধারালো হয়েছে। কারণ কাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। উপায়ও তাঁর জানা। কেবল সতর্কতার সঙ্গে ঠিক সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণই তাঁর স্বপ্নকে সার্থকতা দান করতে পারে। কবি জানেন তিনি পারবেন। গ্রাম্য-কৃষকের ওপর তাঁর ভরসা আছে। তাই ইতিবাচক জীবনভাবনায় উদ্বুদ্ধ কবি বলতে পারেন—

"দিকে দিকে জয়োদ্ধত
জীবনের উদ্দাম ঘোষণা।
দু'হাতে ছড়ায় সুর
প্রাচুর্যের মুঠো মুঠো সোনা।"[১৪]

(এই আশ্বিনে)

'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের তীব্র আর্থ-সামাজিক সঙ্কট, যেখানে নিরন্নতা, উদ্বাস্তুতা ও নিপীড়নের করাল ছায়ায় আবৃত বাংলার জনপদ। কিন্তু এই কাব্য কেবল হতাশার দলিল হয়ে ওঠেনি; বরং বহু কবিতার অন্তিমে কবি আঁকেন শোষণমুক্তির এক দীপ্ত স্বপ্নচিত্র— যেখানে পরাজিত নয়, বরং দৃপ্ত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কৃষকের জাগরণ তুলে ধরা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে সুভাষ যখন প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার বুক চিরে হাঁটছেন, তখন চোখে পড়ে দুর্বিষহ দারিদ্র্য, ভূমিহীন কৃষকের হাহাকার, এবং অন্নের জন্য প্রতিদিনের লড়াই। সাম্যবাদী চেতনায় দীপ্ত কবির পক্ষে এই বাস্তবতাকে নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সোনালি ধানের দিকে তাকিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিছক ফলনের নয়— তা এক সম্ভাব্য সোনালি দিনের প্রতীক, যেখানে শোষণ থাকবে না, থাকবে ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি। সুভাষ জানতেন, চিন কিংবা রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কীভাবে সাধারণ মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে অধিকার, সম্মান ও নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। সেই ইতিহাস থেকেই তিনি সাহস ও আশার আলো খুঁজে পান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল— গ্রামবাংলার কৃষকও একদিন শোষণচক্র ছিন্ন করে দাঁড়িয়ে যাবে মাথা উঁচু করে। এ বিশ্বাস কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক বোধ ও অভিজ্ঞতার থেকেই উৎসারিত। এই প্রেক্ষিতেই 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থ পরিণত হয় এক বিপ্লবীর সমাজ-রূপান্তরের ইস্তেহারে। এখানে কবিতা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিশ্রুতির অক্ষর, আর সম্ভাবনার দীপ্ত মানচিত্র— যা দিক নির্দেশ করে একটি নতুন ভোরের।

'অগ্নিকোণ' কাব্যে পূর্বের রাজনৈতিক উত্তাপ পুরোমাত্রায় বজায় থাকলেও একটি স্বতন্ত্র সুর কোথাও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 'একটি কবিতার জন্য' এবং 'মিছিলের মুখ' কবিতা দুটির কথা। 'একটি কবিতার জন্য' কবিতায় কবি জানিয়েছেন কত বিচিত্র ভাবাবেগ, প্রকৃতির বিপুল বর্ণ-সমাবেশ একটি কবিতার জন্ম দেয়—

"একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিলে এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নঘদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্য।।"[১৫]

(একটি কবিতার জন্যে)

আগুনের নীল শিখা, আকাশের ঝড়, সমুদ্রের উদ্দামতা, বিদ্যুতের ঝলকানি, অরণ্যের হাতছানিই যথেষ্ট নয় একটি কবিতা সৃষ্টির জন্য। অন্যগত দিনের ফতোয়া নিয়ে, মৃত্যু ভয়কে জয় করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে একটি মিছিল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 57
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসে কবিতা সৃষ্টির জন্য। কবিতা সৃষ্টি সামান্য ঘটনা নয়— এটাই কবির মূল বক্তব্য। কিন্তু তার জন্য কবি যে সমস্ত চিত্রকলা রচনা করেন, মিছিলেন গানকে মিশিয়ে দেয় কবিতার প্রকরণে— তা সত্যই অনবদ্য।

'মিছিলের মুখ' কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমকে জনসমক্ষে প্রথম স্বীকৃতি দিলেন। এর আগে পর্যন্ত সংগ্রামের রাস্তায় তাঁর কাছে প্রেম ছিল বিলাসিতার বিষয়। কিন্তু এই প্রথম প্রেম আসলো কবির জীবনে। যদিও 'চিরকূট' কাব্যের 'সীমান্তে', 'কাব্যজিজ্ঞাসা' কবিতার প্রেমের অনুষঙ্গ রয়েছে কিন্তু তা নেহাতই রাজনৈতিক প্রসঙ্গসূত্রে। এই প্রথম সুভাষের জীবনে প্রেম আসলো রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে। 'মিছিলের মুখ' কবিতাটির রচনার ইতিহাস সম্পর্কে কবি জানাচ্ছেন—

> "মিছিলের মুখ বলে আমার একটি কবিতা আছে, তাতে মিছিলে দেখা একটি মেয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কবিতাটা আমি লিখেছিলাম প্রথমবার জেল থেকে বেরোবার পর। সেই সময় কলকাতায় একটা নেতিয়ে পড়া ভাব ছিল, তার আগে যে রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ, সেটা ছিলো না। এবং আমি শুধু নয়, আমরা অনেকেই তখন চাইছিলাম যে কলকাতায় আবার সেই মিছিলের জীবন ফিরে আসুক। আমার সেই চাওয়াটা আবার মিছিল হোক কলকাতায়। এই চাওয়াটা আমার 'মিছিলের মুখ' কবিতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।"[১৬]

প্রেমের অনুষঙ্গে রাজনীতি নয় বরং রাজনীতির অনুষঙ্গে প্রেম আসলো কবির জীবনে। রাজপথের মিছিলে যেমন সর্বহারা মানুষ খুঁজে নেয় মুক্তির পথ, তেমনি সুভাষ খুঁজে পেয়েছেন তার কাঙ্ক্ষিত নারীকে। যাকে সঙ্গে নিয়েই ভালোবাসার পথ ধরে কবি গড়তে চেয়েছেন নতুন সমাজ—

> "অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
> নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার
> জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ বসিয়ে দিতে
> ডাক দিই
> যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
> আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
> দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
> পারাপার করতে পারে।"[১৭]
>
> (মিছিলের মুখ)

সামগ্রিক বিচারে একথা বলাই যায়, 'পদাতিক' পর্বে যে মতাদর্শে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেকে সংহত করেছিলেন, 'চিরকুট' পর্বে এসে সেই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ়, আরও পরিণত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। শুরুতে তাঁর কবিতা ছিল উত্তাল, প্রতিবাদী, ঝাঁঝালো রাজনৈতিক ভাষ্যে পরিপূর্ণ—যেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ময়দান থেকে উঠে আসা শ্লোগান। কিন্তু 'চিরকুট'-এ এসে সেই ভাষা পেল এক নতুন শৈল্পিক ভারসাম্য। রাজনৈতিক বক্তব্য হারায়নি তার গভীরতা, তবে রূপ নিয়েছে আরও সংহত, স্থিত ও সুপরিকল্পিত শিল্পভাষ্যে। এখানে কবির কণ্ঠে আগের মতো তীক্ষ্ণতার ঝাঁজ কমে এলেও, তাঁর বক্তব্য হয়েছে আরও সুদৃঢ়, সংগঠিত, এবং মনন-সমৃদ্ধ। যেটুকু হারিয়েছে উগ্রতা, তার স্থলে এসেছে শিল্পের পরিপক্কতা। সেই অর্থে 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থ যেন রাজনৈতিক কবিতার ভেতরেও কাব্যিক সৌন্দর্যের সংবেদনশীল অনুরণন। তবে 'অগ্নিকোণ' পর্বে আবারও দেখা যায় সেই পুরনো সুভাষকে— যিনি জ্বলন্ত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন তীব্র প্রতিবাদের ভাষ্য। সমাজ ও সময়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা যেন পুনরায় তাঁকে ফিরিয়ে আনে প্রগাঢ় রাজনৈতিক চেতনার দিকে। এই পর্যায়ে এসে মনে হয়, কবির দায়বোধ যেন দুই মেরুতে বিভক্ত— একদিকে সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ, অন্যদিকে কবিতার শিল্পমান। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ 'পদাতিক' পর্বে, তিনি যতটা দায়বদ্ধ ছিলেন সময় ও সমাজের প্রতি, ঠিক ততটাই উপেক্ষা করেছিলেন কাব্যের শৈল্পিক প্রয়োজনকে। ফলে প্রথম পর্বের কবিতাগুলি যেন হয়ে ওঠে আগুনে পোড়া পঙ্‌ক্তি— যেখানে উত্তাপ আছে, কিন্তু সেই উত্তাপ অনেক সময়েই শৈল্পিক ভারসাম্যকে ছাপিয়ে যায়। পরবর্তী পর্বগুলোয় এই

ভারসাম্যের সূক্ষ্মতা ও পরিণত ভাবনা তাঁর কবিতাকে দেয় এক নতুন মাত্রা— যেখানে মতাদর্শ ও শিল্প একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক', 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, নিউ এজ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৫৯, পৃ. ৮০

২. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'সকলের গান', 'পদাতিক', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৮

৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক', 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, নিউ এজ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৫৯, পৃ. ৮১

৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'মে-দিনের কবিতা', 'পদাতিক', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৭

৫. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'কানামাছির গান', 'পদাতিক', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, পৃ. ১৪

৬. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'বধূ', 'পদাতিক', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২০

৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'কাব্যজিজ্ঞাসা', 'চিরকুট', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩০

৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'গ্রাম্য', 'চিরকুট', সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ৮

৯. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'চিরকুট', 'চিরকুট', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৪

১০. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'চিরকুট', 'চিরকুট', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৪

১১. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'স্বাগত', 'চিরকুট', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৬

১২. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'স্বাগত', 'চিরকুট', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৬

১৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'স্বাক্ষর', 'চিরকুট', সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ১৯-২০

১৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'এই আশ্বিনে', 'চিরকুট', সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ১৩

১৫. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'একটি কবিতার জন্যে', 'অগ্নিকোণ', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৪

১৬. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক: লোথার লুৎসের সঙ্গে কথাবার্তা', 'কবিতার বোঝাপড়া', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ১৫৩

১৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'মিছিলের মুখ', 'অগ্নিকোণ', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দশম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৫